অঞ্জন চক্রবর্তী

তিনি প্রেমের গল্প লিখতেন না!

(১)

সম্পাদকের সঙ্গে এক শীতের সকালে হানা দিয়েছি তাঁর বাড়িতে। বিধান শিশু উদ্যান পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কল্পনায় আঁকার চেষ্টা করছিলাম এই বিরল প্রতিভার মানুষটিকে যিনি একই সঙ্গে সকল ক্রীড়া সাংবাদিক এবং মননশীল কথাসাহিত্যিক। দেখার পর বিস্ময় বাড়ে বই কমেনি।

মৃত্যুর দুবছর আগের মতি নন্দী 'শবাগার' গল্পের মুকুন্দর মতোই সকালে উঠে কান পাতেন বাতাসে আশঙ্কা কারোর মৃত্যুর খবর আসবে হয়তো। সেই সঙ্গে এই ভাবনাও আসে যে আরো একটা দিন, আরো একটা শীতের রাত নিজে পার হয়ে এলেন তিনি।

আমরা গেছিলাম 'এবং আমরা'র বইমেলা সংখ্যার জন্য সাক্ষাৎকার নিতে। আমাদের এলোমেলো প্রশ্নের এবড়োখেবড়ো খোঁচাতেও খুলে যাচ্ছিল আশ্চর্য পরৎ। প্রেমের গল্প তেমন লিখতে না চাওয়া নিয়ে কথা উঠল। জানালেন এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহের সীমাবদ্ধতার কথা। 'তবে'... বলে একটা বাক্য শুরু করতে যেতেই স্বভাবসিদ্ধ প্রগল্‌ভতায় বলে উঠলাম 'রাজার কথা বলছেন তো?'

বিরক্তির বদলে দেখলাম একরকম ছেলেমানুষের হাসি ফুটলো মুখে। 'হ্যাঁ, ওটার কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। ওটাকে প্রেমের গল্প বলতেই পারেন। তবে কি জানেন, ওটা আমার ঠিক আসতো না'।

মতি নন্দী অহেতুক বিনয়ের মানুষ নন। তাঁর গল্পের পরিসরের দিকে তাকালে তাঁর বক্তব্য অসঙ্গত মনে হয় নি। মতি নন্দীর গল্পের বাস্তবতা স্বাধীনতা-পরবর্তী কঠিন-কঠোর জীবন সংগ্রামের বাস্তবতা যেখানে ভালোবাসার কুসুমকে প্রশ্রয় দেবার মতো ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক পরিবেশ-পরিস্থিতি নেই। সেখানে বরং ফুটে উঠেছে লালসার ফণিমনসা। কালীবাবুর মন প্রাক্তন পরিচারিকার খলবলে মাংসে আঙুল চালাবার সম্ভাবনায় চনমন করে ওঠে (নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান), ছেলেকে পুলিশি হেফাজত থেকে ছাড়ানোর টেনশন কাটাতে মুকুন্দ শিপ্রার শরীরের ভাবনায় ডুব দেয় (শবাগার)। যৌবন চাকরির ভাবনায় ক্লিষ্ট, কখনো বা আন্দোলনের আগুনে ঝাঁপ দেওয়া বেপরোয়া পতঙ্গ। এর বাইরের উদাহরণটি আমার চোখে আরো ভয়াবহ। 'শবাগার' গল্পের উঠতি ফুটবলার শিশির যৌবন ঢাকতে ধুতি পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়ায় যাতে তাকে বুড়োটে দেখায়। হ্যাঁ, সেই দ্রোহকালে 'যুবক' বা 'জোয়ান' দেখতে লাগাটা ঝুঁকির, রাষ্ট্রযন্ত্রের 'সৎ পাহারাদাররা' তাকে সম্ভাব্য রাষ্ট্রদ্রোহী বলে চিহ্নিত করতে পারে এবং 'দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে' সাজানো এনকাউন্টারে তাকে শুইয়ে দিতে পারে শয্যায়! হ্যাঁ, যুবক হওয়াটাই যেখানে অপরাধ সেখানে প্রেম কোথা দিয়ে ফুটবে?

ফোটে। তবুও ফোটে। আর সেই ফোটার কাহিনি 'রাজা'। 'রাজা' পড়তে গিয়ে মনে পড়ে যায় বহু পরে লেখা কবীর সুমনের গান—মেয়ে করে প্রেম বৃথা হয়রানি/ প্রেমিকের আছে টো টো কোম্পানি/শনিবারে তারা দেয় ছুট্/ছুটবে কোথায় প্রেম তালকানা!/গোপনীয়তার নেই মালিকানা/সেই প্রেমিকেরও আসল ঠিকানা দশ ফুট বাই দশ ফুট। এই গল্পের ছেলেটি ও মেয়েটি (হ্যাঁ, সারা গল্পে তারা শুধু ছেলেটি আর মেয়েটি, সময়ের প্রতিনিধি) ছুট লাগাতে চেয়েছিল ট্রেনে চেপে শহর থেকে কিছুক্ষণের জন্য, তারপর আবার ফেরার পথের অবধারিত হাঁ-মুখ। কিন্তু এই অবকাশটুকুও কেউ তাদের দিল না। ডানের কবিতার মতো 'For God's sake hold your tongue and let me love' বলে ওঠার কোনো জায়গা তাদের নেই। কেউ শুনবে না, শুনলে ব্যঙ্গ করবে, এমনকি মারধোরও করতে পারে। হ্যাঁ, মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়েই ছেলেটিকে নেমে পড়তে হয় হাতের কাছের স্টেশনে। তাদের সাধের গন্তব্যে তারা পৌঁছতে পারেনি। তবু মেয়েটির হাতের আকুল সেবা তার আঘাত, বেদনা, লাঞ্ছনা চকিতে ঘুচিয়ে দেয়। নেমে আসে সূর্যাস্ত। প্রহর শেষের আলোয় রাঙা হয়ে ওঠে ভালোবাসা।

সবুজ ধানখেতের ওপাশে বহু দূরে গ্রাম দেখা যায়। গ্রামের মাথার কিনার ঘেঁষে সূর্য নেমে এসেছে। দুটি মেল ট্রেন ইতিমধ্যে চলে গেছে। মেয়েটি মুঠো শক্ত করে ধরে বলল,"তখন তুমি যেন কি বলবে বলেছিলে?"

ছেলেটি ওর মুখের দিকে তাকাল। হাসবার জন্য ঠোঁট দুটি মেলে ধরতে গিয়ে যন্ত্রণায় পারল না। একটি চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। কোনোরকমে একটি হাত তুলে মেয়েটির গালে আঙুল বুলিয়ে সে বলল, "ইচ্ছে করেছিল বলি, এখন আমি সারা পৃথিবীর রাজা"।

এই গল্পের শুরুতেই ছিল উত্তাল সময়ের ছবি। মেয়েটি এসে পৌঁছায় ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে। তারই বা দোষ কি যদি "বাবার হঠাৎ অসুখ করে, মা যদি রান্নাঘরে না যায়, দাদা যদি প্রশ্ন করে বসে আজ তো ছাত্র ধর্মঘট তাহলে কলেজ যাচ্ছিস কেন"। ধর্মঘট শুধু কলেজে নয়। একটু পরেই আমরা জানতে পারি ছেলেটি খেয়ে আসে নি। "বাবা টাকা জোগাড় করতে বরানগর গেছে ফিরে বাজার করবে তারপর রান্না হবে।" টাকা নেই, কারণ বাবার কর্মস্থলে ধর্মঘট চলছে, কবে মিটবে ঠিক নেই। তবু ছেলেটি ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কেটেছে, কিছুক্ষণের জন্য একটু রাজা সাজা! তারা অবশ্য ফার্স্ট ক্লাশে ওঠে না, ওঠে ভিড়ের সেকেন্ড ক্লাসেই। উপদ্রব এড়াতে এড়াতে যখন তারা ফার্স্ট ক্লাশে শেষে ওঠে তখন ঘনিয়ে আসে কাহিনির irony। প্রোলেটারিয়েটের সংকট ও সংগ্রামের আবহতে বেড়ে উঠছে লুম্পেন রাজ, বাড়িয়ে দেওয়াও হচ্ছে তাদের। এদের অবৈধ যাত্রার অশালীন আচরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খায় ছেলেটি। ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় নয়, সে রাজা হয় গ্রামের স্টেশনের কৌলীন্যহীন প্ল্যাটফর্মে, প্রেমিকার শুশ্রূষায়।

এদের ভালোবাসা অবশ্য শুধু 'তুমি-আমি'র জগতের নয়। এর সামাজিক ব্যাপ্তি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের। উৎপাতে ভরা ট্রেন যাত্রার সবচেয়ে কোমল লহমাটিতে আসা যাক ঃ

" 'মোটে চার ঘন্টা!' মেয়েটি বিষণ্ণ চোখে বাইরের সবুজ ধানখেতের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর জানলায় রাখা আঙুলে ছেলেটি আলতো করে তার করতল রাখল। মেয়েটি

মুঠোয় চেপে ধরল।

'দেখেছ, কত ধান হবে এবার।'

'অনেক। দাম তো এখনই কমতে শুরু করেছে।'

মেয়েটি জানলায় মাথা রেখে ঘাড় কাত করে ছেলেটির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। হাওয়ায় চুলগুলো উড়ে কপালে চোখে পড়ছে। ছেলেটি আঙুল দিয়ে সেগুলি যথাস্থানে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা শুরু করল। মেয়েটির চোখের পাতা মুদে এল।

'এবার সবাই পেট ভরে খেতে পাবে।' মেয়েটি বলল।"

এরা শুধু নিজের কথা ভাবে না। ভাবে সবার কথা। এই ভাবনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় একটি ব্যতিক্রমী প্রেমের কবিতার কথা। উৎপল কুমার বসুর 'কুচবিহার' ঃ

"আমাদের এ দেশে এবার/চাষবাস ভাল হল—শাকসবজি উঠেছে প্রচুর/পুকুরে নরম মাছ—হাঁসের নতুন ডিম—রিক্সায় যদি বা আস চারআনায় পৌঁছে দেবে ওরা।"

দূর থেকে আগতা প্রেমিকাকে এই সামাজিক সুখের খবরগুলি জানিয়ে দেওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ অনুভব করেছেন কবি। ভালোবাসা দুজনের অনুবিশ্বে সীমাবদ্ধ নয়, বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে মিল রেখেই তার ছন্দ, তার সুর। সে কথাই ফুটিয়েছেন মতি নন্দী।

(২)

ওরা যেতে চায় শহর থেকে দূরে। পেতে চায় দুদণ্ড শান্তি। আবার গ্রাম থেকে শহরে আসে মানুষ তার ভালোবাসার মানুষকে শহরের জাদুতে চমৎকৃত করতে। শহরে উঁচু-উঁচু বাড়ি, উঁচু-উঁচু ব্রিজ, সবকিছুকেই যেন আকারে ছাপিয়ে যেতে চায়। এ শহর কিন্তু 'এল ডোরাডো' নয়, শহরের ইটের পাঁজরে অনেক মর্মবেদনার কথা লুকিয়ে। 'রাজা' গল্পের আহত, অপমানিত ছেলেটি মেয়েটির প্রেমস্পর্শে নিজেকে রাজা ভাবে। 'শহরে আসা' দুলাল তার স্ত্রী গিরির চোখে গল্পের শেষে কপর্দকহীন অবস্থাতেও রাজপুরুষ হয়ে ওঠে, শেষ কপর্দকটুকু বেয়ারার হাতে বকশিস হিসেবে তুলে দিয়ে যে সেলামটি সে পায় তাতে তাকে 'দারোগাবাবুর মতো লাগছিল'। কপর্দকহী অথচ ভালোবাসায় সংযুক্ত দুটি মানুষ পায়ে হেঁটেই শহর থেকে গ্রামে যাত্রা শুরু করে।

সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। 'তিনকুলের কেউ না থাকায়' তার বিয়ে হতে বেশ দেরি হয়ে গেল। দর্জির দোকানে সেলাইয়ের কাজ করে হাতে পায় মাসে আশি টাকা। তাই নিয়েই দুলাল আপ্রাণ চেষ্টা করে সতেরো বছরের গিরিকে যত্নে রাখতে। তিনকূলে গিরিরও কেউ নেই, পাড়ার লোকেদের মধ্যস্থতায় বাহান্ন-তিপান্ন বছরের বর জুটে যাওয়াও তার মতো মেয়ের কপালের ব্যাপার। তার উপর দুলাল সত্যিই হৃদয়বান। অসমবয়স সত্ত্বেও এই দম্পতি পরস্পরকে তাই আঁকড়ে নিয়েছে জীবনের টানে।

'শহরে আসা' গল্পের নামকরণেই ফুটে উঠেছে গল্পের মুখ্য ঘটনার আভাস। শহরে আসতে পারাটা এই গরিব দম্পতির কাছে প্রায় স্বর্গের মতনই। গিরি কখনো কলকাতায় আসেনি, সব উঁচু-উঁচু জিনিস দেখে তার বিস্ময়ের শেষ নেই। তার এই বিস্ময়কে নির্দোষ মিথ্যাচারে আরো উসকে দিয়ে নায়ক সাজার চেষ্টা করে দুলাল।

কিন্তু বড়ো সবকিছুই তো আর সুব্যবস্থায় বড়ো নয়। ডবলডেকার বাসের দোতলায়

চাপলে শহরকে উঁচু থেকে দেখার তৃপ্তি পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু অফিসটাইমের জনারণ্য অনভ্যস্ত মানুষকে নামার সময় বিপদে ফেলার জন্য যথেষ্ট। শহরে বেড়াতে আসা দম্পতির বুকের স্পন্দন বেড়ে যায় পরস্পরের হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। নামতে না পারা দুলাল যখন ফেলে আসা বাসস্টপে গিরিকে খুঁজে পায় তখন চেষ্টাকৃত সপ্রতিভতার অন্তরালে থেকে যায় প্রাণ ফিরে পাবার স্বস্তি।

শহরের মজা চাখতে এসে স্নায়ুতন্ত্রে শীতল ঝটকা খাওয়া ক্লান্ত দম্পতি এবার একটু জিরোতে চায়। দুলালের মনে পড়ে রাইমোহনদার চায়ের দোকানের কথা। সেখানে জিরনো যেতে পারে, কিন্তু শান্তির ভাবনায় একটু কাটার খোঁচাও থাকে। রাইমোহনদার কাছে থেকে গেছে কিছু ধার। তবু আশা দিলদরিয়া রাইদা নতুন বউকে দেখে ওসব তুলবেই না, বরং 'চপ-কাটলেট' খাইয়ে দেবে।

না, রাইমোহনদার দিল-দরিয়াপনায় কোনো ঘাটতি হয়নি। বরং হৃদয়ের অতিরিক্ততায় সে হারিয়ে বসে আছে তার স্বাধীন রোজগার, তার দোকান, তার আত্মসম্মান। তার 'কার্তিক ঠাকুরের মতো চেহারা' তাই এখন লম্বা কাঠামোয় 'বাঁখারির' মতো হাত-পা বহনকারী এক বেঢপ শরীর। 'গোঁফটা পর্যন্ত নেই'। কথায় কথায় জানা যায় এককালের পীরিতের রূপোপজীবিনী আঙুরের চিকিৎসা করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে সে। ছেলের নামে লিখে দিতে হয়েছে দোকান, তার বিনিময়ে স্ত্রী তাকে খেতে ও শুতে দেয়। অর্থাৎ সে এখন স্ত্রী-পুত্রের আশ্রিত, অন্নদাস।

বৈধ দাম্পত্যবন্ধনে বাঁধা পড়া গিরি আর দুলালের ভালোবাসার সঙ্গে কোথায় যেন একাকার হয়ে যায় রাই আর আঙুরের অবৈধ সম্পর্ক। রাইয়ের স্ত্রী ও ছেলের তুলনায় অনেক মানবিক মনে হয় রাইকে। অসুস্থ আঙুরের কাছ থেকে আর কোনো শারীরিক আনন্দ পাওয়ার সুযোগ ছিল না রাইয়ের। সে যা করেছে তা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা থেকেই।

এরপর আমরা দেখবো নিতান্তই স্বল্প আয়ের মজুরের আর সবকিছু ফুরিয়ে যাওয়া দোকানদারের পারস্পরিক হৃদয়বত্তার ছবি। বউকে নিয়ে আনন্দ করতে আসা দুলাল ঠিক করে এই সর্বস্বান্ত মানুষটার দেনা চুকিয়ে তাকে কিছুটা স্বস্তি ও সম্মান দেবে। সেই করতে গিয়েই দুলাল আরো বাড়িয়ে ফেলে তার কর্তব্যের পথ। রাইদার উদ্ধত ছেলের দোকানে খেয়ে, বেয়ারাকে বকশিস দিয়ে সে যেন বদলা নিতে চায় অগ্রজ বন্ধুর অপমানের। সেই পর্ব সেরে রাইদার দেনা মিটিয়ে তার কাছে আর কানাকড়িও থাকে না। অন্যদিকে 'ভাসুর' রাইদা ভোলে না তার কর্তব্যকর্ম, এতদূর থেকে আসা 'বৌমা'কে আশীর্বাদস্বরূপ সে তুলে দেয় সিঁদুর কৌটো। আপাতদৃষ্টিতে মদ্যপ, লম্পট মানুষটির হাত দিয়ে সিঁদুর কৌটো উপহার দিইয়ে যেন এক আশ্চর্য irony তৈরি করেন মতি নন্দী। শুধু গিরি নয়, রাইদার দিকে তাকিয়ে আমাদেরও মনে হয় 'যেন হাওড়া ব্রিজ বা বিশতলা বাড়িটা' দেখছি। গিরির চোখে দুলালকে 'দারোগা'র মতো দেখলাম আমরাও।

জেমস জয়েসের 'অ্যারাবি' গল্পের কিশোর তার স্বপ্নের শহরে এসে ডুবেছিল হতাশার অন্ধকারে। দুলাল-গিরির 'শহরে আসা' সার্থক হয় শহরের চটক দেখে নয়, রাইয়ের মতো এক আশ্চর্য মানুষকে দেখে। অন্যদিকে সব পয়সা খুইয়েও তারা টের পায় তাদের ভালোবাসা, তাদের বিরাটত্বকে যার মাপ চলতি দুনিয়াদারির জ্যামিতিতে নেই।

পায়ের নীচে মস্ত লোহার ব্রিজ কাঁপে, কিন্তু গিরির তার স্বরূপ দেখে বিস্ময়মুগ্ধ হাসি দুলালকে তুলে দেয় সব ব্রিজ, সব বাড়ি, সব দুর্ভাবনার উপরে।

(৩)

'বেহুলার ভেলা' গল্পে প্রমথ কাজের ভারে মেজাজ হারিয়ে ফেলা স্ত্রী অমিয়ার বাড়তি গেরস্থালীর কাজে সাহায্য করতে গিয়ে টের পায় বঁটির ধার ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। সে ভেবে অবাক হয় কীভাবে এই বঁটি দিয়ে এত সুন্দর খোসা ছাড়ায় অমিয়া! অভ্যাস এটাই এই প্রশ্নের সহজ ও যথাযথ উত্তর। সংসারে যখন ভালোবাসার ধার নেই তেমন তখনো কি অভ্যাস টেনে নিয়ে চলে নানান অভাব-অভিযোগে ক্লিষ্ট দাম্পত্যজীবনে? তবু অমিয়া যখন নতুন-বউ তখন মাংসের সের ছিল ছ আনা আট আনা, পুতুলের সময় তিন টাকা। এটাই প্রমথর জীবনের সারসত্য নয় আর নয় বলেই এক টুকরো মেটুলিসহ তিনপো মাংস কিনে ফেলে। কেনার পর মনে হয়—অনেকখানি দিয়েছে, অমিয়া দেখে নিশ্চয়ই খুশি হবে।

'হাড়গোড়সার ছেলের হাত-পায়ের মতোই ন্যাতানো গলিটা'য় প্রমথ ঢোকে মাংসের ঠোঙা নিয়ে। দেখা হয় কবিতা লেখা, রাজনীতি আওড়ানো মিহিরবাবুর সঙ্গে। মিহিরবাবুর মুখে স্ট্রাইকের খবর, জিনিসপত্রের দাম বাড়ার বিরুদ্ধে স্ট্রাইক। কিন্তু তখন প্রমথ অন্য মেজাজে। তিন টাকায় পৃথিবী কিনে সে তখন ছড়িয়ে দিতে চায় আনন্দর রেশ তার ঘরে, তার স্ত্রী-ছেলেমেয়ের মধ্যে। তার দুই ছেলে বড়ো হয়ে 'বেকারির গ্লানি', মেয়ে বিবাহযোগ্যা, বলা ভালো গরিব বাপের বিবাহযোগ্যা মেয়ে যার একটা সিনেমা দেখতে যাওয়াও বিলাসিতা। এক ছেলে চাঁদু ফুটবল খেলে, একটি স্কুলে ভর্তি না হওয়া খোকা। গলির মতোই অকালে জরাজীর্ণ আরেকজন, রাধু।

''তেইশ বছরেই বুড়িয়ে গেছে ওর শরীর-মন। মনে হয় হাসিখুশি আনন্দ যেন কিছুই নয়। জীবনটা শুধু দুখ্যু, দুখ্যু আর দুখ্যু কাটানোর চেষ্টাতেই ভরা। অথচ ওর বয়স তেইশ।''

অথচ প্রমথ তাকায় কেষ্টচূড়ো গাছের চিমসে ডালগুলোর ফাঁক দিয়ে তাকায় আকাশের দিকে। 'চিমসে ডালে' কৃষ্ণচূড়া গাছের দৈন্য পারিপার্শ্বের ম্লানতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবু যেমন করেই হোক বসন্ত আছে। রাধুর তেইশ ওই চিমসে-কাঠি ডালে ফুল ধরার মতোই। আমাদের চকিতে মনে পড়ে শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা'—কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন/কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়। দারিদ্র্য পীড়িত পিতা চোখের সামনে দেখে যান পূর্ণ-যৌবন ছেলের ম্লানিমা। মেনে নিতে হবেও।

কৃষ্ণচূড়ায় যেমন করে হোক ফুল ধরেছে, কিন্তু রাধাচূড়া শূন্য। প্রকৃতি যেন সংসারের বিজোরভাবই তুলে ধরছে। প্রমথর খুশি থাকার ইচ্ছে। কিন্তু অমিয়া? সে হয়তো সে এখন পুতুলকে তেল অপচয় করার জন্য বকাবকি করছে। অথচ সেও একদিন পুতুলের মতোই সুন্দর ছিল। তার বড়োলোক, আলাদা হয়ে যাওয়া জায়ের মতো নিপাট সাজগোজের বালাই নেই তার। সাজলে আজও যেন পুতুলকে হার মানাতে পারে সে। কিন্তু সংসারের তাপে সে ভাজাভাজা হয়েই চলেছে। কে বলবে একদিন এই অমিয়াই একদিন বাড়ির বড়োদের নজর ও শ্রবণ এড়িয়ে ছুটেছিল বেলফুলের মালা কিনতে?

তিন টাকার মাংস কিনে যে সুখস্বর্গ ক্ষণিকের জন্য তৈরি করতে চেয়েছিল প্রমথ তা

যেন নিছক কাচের স্বর্গের মতোই ফেটে পড়ল। চাঁদু এল রেঁস্তোরায় খেয়ে, তার দল সাফল্যের জন্যই খাইয়েছে। তোলা রইল তার ভাগ। মায়ের বকুনিতে অভিমানাহতা পুতুল না খেয়েই শুয়ে পড়ে আর মেয়ের হয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রমথ অনুভব করে এক চূড়ান্ত অপ্রীতিকর বাস্তবতার। প্রমথ দেখে "অমিয়ার চাউনি কসাইয়ের ছুরির মতো শান দিচ্ছে"। সাধের মাংসের খোলা হাঁড়িতে প্রমথ দেখতে পায় "থকথক করছে রক্ত"। ক্রুদ্ধ প্রমথ অমিয়ার কাঁধ ধরে ঝাঁকায় আর তার চোখ দুটো "মরা পাঁঠার মতো ঘোলাটে" হয়ে আসে।

মিহিরবাবু কবিতা লিখলেও মিথ্যা বলে না—একথা মানে প্রমথ। স্ট্রাইক অবশ্যকরণীয়। প্রমথ টের পায় সে এক ক্রোধী দ্রোহকালের শরিক যেখানে চকিতে মাথা তোলে আত্মঘাতী চণ্ডরাগ আর সেই রাগের জাগতিক বাস্তবতাকে মহাজাগতিক বাস্তবতায় প্রতিফলিত করেন মতি নন্দী।

"মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল সে, তারা জ্বলছে। একটা কামার মানুষকে তাতিয়ে বিরাট এক হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চলেছে, তারই ফুলকিগুলো ছিটকে উঠেছে আকাশে"।

প্রমথ টের পায় তাদের সে ভালোবাসা আর নেই। তারার নীচে ছাদে বসে সে অমিয়ার কাছে স্বীকারও করে ফেলে এই প্রেমহীনতার উপলব্ধি :

"জানো অমি, মনে হচ্ছে আমি আর ভালোবাসি না, বোধহয় তুমিও বাসো না। তা না হলে তোমার মনে হবে কেন আমি তোমার গায়ে হাত তুলতে পারি। অথচ সত্যি সত্যি তখন ইচ্ছে হয়েছিল তোমার গলা টিপে ধরি। অমি, এখন একটা মড়া আগলে বসে থাকা ছাড়া আমাদের কাজ নেই"।

এই নিদারুণ প্রকাশ সত্য হলেও শেষ সত্য নয়। তাই একটু পরে প্রমথ বলে ওঠে— কেঁদো না, মরে গেলেই মানুষ কাঁদে, আমি কি মরে গেছি। না, সবকিছু শেষ হয়ে যায় নি। বেহুলা যেমন লখিন্দরের বেঁচে ওঠার সাধনায় গাঙুরের জলে ভেলা ভাসিয়েছিল তেমনি প্রমথরাও তাদের সেই হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার পুনর্জীবনের স্বপ্নে ভাসমান। হ্যাঁ, এভাবেই বাঁচে নিম্নবিত্ত মানুষ, আগলে রাখে তাদের তুচ্ছ গেরস্থালী। তাদের 'বেহুলার ভেলা'ই এই প্রেমহীন পৃথিবীর প্রাণহীন লোভ-লালসার প্রতিবাদ।

মতি নন্দী তাই তথাকথিত প্রেমের গল্প না লিখেও লিখে রাখেন প্রেমেরই জয়গান। বেহুলার ভেলার সঞ্চার পথের জল ছিটকে এসে লাগে আমাদের মগ্ন চৈতন্যে আর আমরাও হয়তো টের পাই সবকিছু শেষ ভেবে নেওয়া ঠিক নয়, প্রাণ তপস্যার শেষ নেই। শেষ নেই ভালোবাসার জন্য ভেসে যাওয়ার। মনে পড়ে যায় সুমনের গান—ভেসে যায় ভেলা এ বেলা ও বেলা একই শবদেহ নিয়ে/আগেও মরেছি আবার মরবো প্রেমের দিব্যি দিয়ে।

(৪)

'এক বৃষ্টির দিনে মাটির সোঁদা গন্ধ, ঝাপসা গাছপালা এবং ঝমঝম আওয়াজের মধ্যে প্রান্তরে একটা তালগাছকে আবিষ্কার করে অরুণ অবাক হয়েছিল।' আর এখন? এখন

পাল্টে গেছে অরুণের অনুভবের জগৎ :

"বারান্দায় বসে, গাছ, পাখি, প্রজাপতি, ঘুঘুর ডাক, ধু-ধু মাঠ বা তৈরি হওয়া বাড়ি কি মাটির গন্ধ এখন তার আর ভালো লাগে না। এসব শুধুই জড়বস্তু, ওদের কাছ থেকে কিছুই ফিরে আসে না।"

কিন্তু কেন এই বদল? লেখার শুরুতে মতি নন্দীর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে নিজের প্রগলভতার একটি দৃষ্টান্ত রেখেছিলাম। এবার পরেরটিতে আসি। 'জানেন, এখন আমেরিকায়, ইউরোপে যে আর্থিক ধস নেমেছিল এখানে তেমনটি না হলেও' বলার সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলেছিলাম 'কপিল নাচছে'! একটু অপ্রস্তুত হলেও বিরক্ত হননি মতি নন্দী। স্বচ্ছন্দে থাকার স্বপ্ন নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ দেখেই। তার সামনে যদি আসে কিছু টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ভালো অংকের টাকা ফেরত পাবার সম্ভাবনা তখন হিতাহিত জ্ঞান অনেক সময়ই লোপ পায়, মনে হয় না প্রতিশ্রুতির অস্বাভাবিকত্বের অন্তরালে বঞ্চনার সম্ভাবনাই নিহিত, সরকারি সীলমোহরের নিশ্চয়তার ব্যাপারটাও মাথায় আসে না তখন। ঠিক এমনি এক ঝুঠা বিনিয়োগের হাতছানিতে ভুলে যায় অরুণ আর বাণী :

"প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে হাত দেব না ভেবেছিলুম ... আজ খোঁজ নিয়ে দেখলুম অফিসের সাত-আটজন টাকা রেখেছে, জানতুমই না। হিমাংশুবাবুর ঝি পর্যন্ত চব্বিশ হাজার রেখেছে।"

"ঝিয়ের চব্বিশ হাজার! অ্যাতো?"

"ঝিয়ের ছেলে কারখানায় কাজ করত অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছিল। দুবছর ধরে কাঠখড় পুড়িয়ে হিমাংশুবাবুই কম্পেনসেশন চব্বিশ হাজার টাকা আদায় করে এনেছে। তারপর এখানে টাকা রাখার জন্য যা কিছু করার সব করেছে, এখন সেই ঝি বস্তির ঘরে বসে মাসে মাসে প্রায় এক হাজার টাকা পাচ্ছে, ভাবতে পার পনেরো টাকা মাইনের বাসন মাজা ঝি....."

"তুমি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সবটাই দাও।"

কথোপকথন থেকে স্পষ্ট এই দম্পতি মেফিস্টোফিলিসের হাতছানিতে ভুলেছে। বাণীর বক্তব্যর 'সবটাই দাও'র স্পষ্ট ঝোঁকে অরুণ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ঢেলে দেয়। প্রথমে যা আসে তা মাইনেরও বেশি। বিষকুম্ভের পয়োমুখ। তারপরেই তারা টের পায় যে স্বচ্ছলতায় তারা একদিন এসে পৌঁছেছে বসন্ত দাস স্ট্রিটের ঝুল, কালি, শ্যাওলা, ঘামের রাজত্বকে পিছনে ফেলে সেই মুখ টলায়মান। অতঃপর ঝাঁপ দিতে হয় চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রসাধনে। ডাল, ভাত, তরকারির মামুলি জীবন চেপে বসে যুবক দেবু এবং বালক বাবুর ঘাড়ে। বাবুর প্রিয় কুকুর কপিলের কপালে এখন বাবুর চেয়েচিন্তে নিয়ে আসা হাড়ই সম্বল।

মেনে নেওয়া, মানিয়ে নেওয়া তো শিশু অবধি গড়াল, কিন্তু তাতেও নিশ্চিত হবার উপায় নেই। সর্বনাশ সর্বব্যাপী তাই দেবুরও কানে গেছে তার বন্ধুর বাবার পাগল হয়ে যাবার কথা। কথায় কথায় অরুণ একদিন বলে ফেলে সে মারা গেলে আর গৃহঋণ শোধ করতে হবে না কারণ ওটা ইনসিওর করা আছে। এই বিপর্যয়ে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে অরুণ আর বাণীর ভালোবাসা? না, প্রমথ আর অমিয়ার মতো তারা স্পষ্ট এই শব্দটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেনি। সত্তরের আবেগ উচ্চকিত, আশির দশকে সেই আবেগ চাপা। তবু সুখী

প্রতিবেশীর গৃহস্থালীর আনন্দের দিকে চেয়ে বাণী ভাবতে বসে তার মানুষটা পাগল হয়ে যাবে না তো। তাকে সেই পুরোনো লোকটা হিসেবে দেখতে পাওয়ার স্বস্তি খোঁজে বাণী। এ-সময়টা 'বেহুলার ভেলা'র দ্রোহকাল নয় যখন 'একটা কামার মানুষকে তাতিয়ে বিরাট একটা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চলেছে', তাই বাণীর পি এফের টাকা ঢালার স্পষ্ট প্ররোচনায় জ্বলে উঠতে গিয়েও থমকায় অরুণ। তবু কোথায় যেন একটা ফাটল, যেখান থেকে প্রাণরস চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। অরুণ অনুভব করে বাণীও সেটা জানে।

কাহিনির সংকট সৃষ্টিতে হিমাংশুবাবু আর তার ঝিয়ের গল্পের একটা ভূমিকা ছিল। গল্পের একধারার প্রবাহে আবার মোড় আনলেন এই হিমাংশুবাবুই। টাকা চোট যাওয়ায় ক্ষুব্ধ ঝি হিমাংশুবাবুকে দোষী সাব্যস্ত করাতে ভেঙে পড়েন হিমাংশুবাবু, তখনো বাণীর মনে হয়েছিল, 'পরের টাকা, নিজের হলে বুঝতেন'। কিন্তু অসুস্থ হিমাংশুবাবুকে নার্সিংহোমে দেখে, তার কথা শুনে একটা সম্পূর্ণ অন্য অভিঘাতে পড়ে যায় এই দম্পতি। দেখার কথাটায় আলাদা ঝোঁক কেন দেওয়া হল সে প্রসঙ্গে পরে আসবো। শোনার জায়গায় একটু আসি। হিমাংশুবাবু জানান তিনি ঝিয়ের ক্ষতির টাকা মাসে মাসে শোধ করবেন :

''আই ওয়ান্ট টু এনজয় মাইসেলফ। নিজেকে আনন্দে ডুবিয়ে রাখতে চাই অরুণবাবু। আমাকে অবশ্যই বাঁচতে হবে আরো কিছু বছর....''

''চব্বিশ হাজার শোধ না হওয়া পর্যন্ত!''

''চব্বিশ নয় আর একটু কম, মাস ছয়েক পেয়েছে তো সেটা বাদ যাবে।''

শুরুতে উল্লেখ করেছিলাম অরুণের তালগাছ আবিষ্কারের কথা। এবার আসা যাক কীভাবে নিজেদের আবাসনকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করছে সে :

''দূরে বসবাস দেখা যাচ্ছে। আধো অন্ধকারে জমি গাছপালা আকাশের মাঝখানে ফিকে কমলা রঙের চৌকো একটা বাড়ি। রূপালি রেলিং ঘেরা ছোটোছোটো বারান্দা। বন্ধ কাচের জানলায় ঘরের আলো। অ্যান্টেনাগুলো শীর্ণ আঙুল মেলেছে আকাশের দিকে ভিক্ষুকের মতো। একটি মানুষও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অরুণ অবাক হয়ে ভাবল, এমন করে তো বাড়িটাকে দেখিনি, অদ্ভুত তো!''

এই শীর্ণ আঙুলের কথা লেখক একটু আগেই উল্লেখ করেছেন হিমাংশুবাবুর অনুষঙ্গে। 'আই ওয়ান্ট টু এনজয় মাইসেলফ' বলার সময় হিমাংশুবাবু 'শীর্ণ আঙুলগুলো দুই গালে চেপে' কথাটা বলেছিলেন। অ্যান্টেনার চাঁদের দিকে শীর্ণ আঙুল মেলে দেওয়া এক আশ্চর্য আনন্দপিয়াসের ছবি এঁকে ফেলে যা বিপন্নতার কাছে হার মানে না। আর তারপরেই বাবু বলে ওঠে 'কপিল নাচছে'। কপিল মানে ভারতের বিশ্বজয়। কপিল মানে উৎসব। কপিল মানে আনন্দ।

সেই আনন্দকে নতুন করে ফিরে পেতে সন্তানের পিছু-পিছু এগিয়ে যায় অরুণ আর বাণী।